চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা-গবেষণা চর্চা ঃ ১৯৯১-২০০০

।। এক।।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে বেড়ে চলেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণা চর্চা। ১৯৯১ থেকে ২০০০ এই কালসীমার মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক নানা ধরনের আলোচনা ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। অধ্যাপনা থেকে শুরু করে নানাধরনের পেশায় নিযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই পর্বে বিচিত্র বিষয় ভাবনায় সাজিয়েছেন তাঁদের গ্রন্থসূচি। আমাদের নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনা গ্রন্থের এ পর্বের সমীক্ষায় এ ধরনের বহুবিচিত্র গ্রন্থের পরিচয় ও পর্যালোচনা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল-এর 'রবীন্দ্রসঙ্গীত মানস' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়সূচিতে রয়েছে—রবীন্দ্রসঙ্গীতমানস, বিভিন্ন আলোচনা, সঞ্চারী, অলংকরণ, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে লেখকের লিখিত ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপন ঘোষ সম্পাদিত 'উদীচী' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি এবং পরবর্তীতে আব্দুল

আহাদ্ ও সন্‌জীদা খাতুন্ সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, সেই সমস্ত রচনাগুলির পরিবর্ধিত সংস্করণ হচ্ছে বর্তমান গ্রন্থ। গ্রন্থভুক্ত প্রথম প্রবন্ধের নামানুসারেই আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা-সুর-তাল-লয়-ভাব-গায়কী, সঞ্চারী ও অলংকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে লেখকের লেখনীতে প্রতিভাত হয়েছে রবীন্দ্র মানসলোকের অনুসন্ধান। গ্রন্থে আলোচনায় বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ ওস্তাদি গানের অতিরিক্ত কসরত পছন্দ করতেন না, কিন্তু ভারতীয় রাগরাগিনীকে গ্রহণ করেছিলেন অন্তর দিয়ে। ভারতীয়-দর্শণ ভিত্তিক নিজস্ব সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ উজ্জীবিত করেছিলেন রাগরাগিনীর রসে। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর গানে ভারতীয় দর্শণ ও রাগরাগিনীর অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটিয়েছিলেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে এইমিলনের প্রতিরূপটিই হল রবীন্দ্র সঙ্গীতমানস। আলোচক গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল মনে করেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে ধ্যানের দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে পার্থিব সমৃদ্ধি থেকে অনেক বড়ো হয়ে ধরা দেয় অন্তরের ঐশ্বর্য। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'অরূপরতন', 'শাপমোচন' ইত্যাদি নাটকের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মোহমুক্ত অনাবিল প্রেম, সত্য, সৌন্দর্য ও আনন্দের পথ, যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যায় না, ধ্যানদৃষ্টিতে পাওয়া যায়। বিশ্ব ও মানবতার সেই অন্তরতম সত্যরূপই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মানসলোক। নান্দনিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে গবেষক সমস্ত রবীন্দ্রমানসলোককে তুলে ধরাবার চেষ্টা করেছেন এভাবেই। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব' অধ্যায়ে লেখক বুদ্ধদেব, যীশু, রামমোহন, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষদের চরিত্রায়ন এবং রবীন্দ্র গান সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ ও নলিনীকান্ত গুপ্তের মন্তব্যের উল্লেখ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা ও সুরের বিশ্লেষণের বাইরে গিয়ে রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তর্লোকের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

> ‘‘মহাপুরুষের এইরূপ চরিত্রায়ণের মধ্যে রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের আপন আদর্শ পরায়ণতা ও নিষ্ঠার দিকটাই প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধাশীলতার পিছনে আছে দীর্ঘকালের অনুশীলন। মানুষের ধর্ম প্রসঙ্গেও তিনি সঙ্গীততত্ত্বের অবতারণা করেছেন। ... যিনি একই সঙ্গে ধর্মচর্চায় ব্যাপৃত, চরিত্র পূজায় পরিতৃপ্ত, সঙ্গীতে নিমগ্ন তাঁর সঙ্গীত রচনায় একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক চরিত্রে ভূষিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মহৎই যাঁর আরাধনার বিষয়—তা প্রকৃতির মহত্ত্ব হোক, প্রেমের মহত্ত্ব হোক বা দেবতার মহত্ত্বই হোক—তাঁর সঙ্গীত সাধনা ‘মরুবিজয়ের কেতন’ উড়িয়ে দেবার জন্য ‘প্রবল প্রাণের’ সাধনা।’’[১]

লেখক গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রমননের আধারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যপ্তির গূঢ়তা সন্ধান করেছেন।

।।দুই।।

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত’ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়সূচিতে রয়েছে—প্রাক্‌কথন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম। আলোচ্য গীতিকবিদের কাব্যগীতির তুলনাশ্রিত আলোচনা, উপসংহার। ভূমিকা থেকে জানা যায় যে এই গ্রন্থটি তাঁর গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন বাংলাগানের চারজন গীতি কবির

(দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল) রচিত সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, দেশপ্রেম বা স্বদেশী গান, হাস্যরসাত্মক গান ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক গানের কাব্য ও সুরের বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসহ নানা বিষয়ভিত্তিক রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপস্থাপনা করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন। গবেষক তাঁর আলোচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কালসীমায় বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। পূজা পর্যায়ের তিনটি পর্ব বা কাল হিসাবে ১৮৮১ থেকে ১৯০০, ১৯০১ থেকে ১৯২০, ১৯২১ থেকে ১৯৩৯ এভাবে বিভক্ত করেছেন। ১৯৮১ থেকে ১৯০০ সময়কালে রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান রচনাকে তিনি ঈশ্বর সাধনার প্রাথমিক স্তর রূপে দেখিয়ে বলেছেন যে এই সময়ের গানে প্রভু, পিতা, ব্রহ্ম, প্রেমময়, রাজা, নাথ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের মধ্যে রবীন্দ্রগানে ব্রাহ্মভাবধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়। আর ১৯০১ থেকে ১৯২০ সময়কালের পূজার গানে ভগবান যেন কবির অন্তরঙ্গ রূপে ধরা দিয়েছেন, ১৯২১ থেকে ১৯৩৯ সময়কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান স্নিগ্ধতায় পূর্ণ যেখানে ঈশ্বর, মানব ও প্রকৃতির মিলন ঘটেছে। প্রেম পর্যায়ের গানগুলিকে স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় চারটি কালে বিভক্ত করে বলেছেন যে ১৮৮১ থেকে ১৮৯৬ সময়কালে রচিত প্রেম পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতে রয়েছে অকারণ বিরহ ও বিষাদ, গানগুলি মূলত ব্যক্তিচিত্তের ভাব ও ভাবনার বেদনা ও আনন্দের গান হয়ে রয়েছে। ১৮৯৭ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত রচিত প্রেমের গানে রূপাশ্রিত প্রেমভাবনা অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শে ধীরে ধীরে যেন অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন, ১৯১৩ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত সময়কালে রচিত প্রেমসঙ্গীতগুলি বৈচিত্র্যময় আর প্রেম পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বশেষ কাল ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সাল অবধি রচিত প্রেমসঙ্গীতে প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর কবির অন্তরের শুদ্ধতায় একীভূত হয়ে ব্যক্তিসত্তার বন্ধনমুক্ত আনন্দময়তায়

ভালোবাসা অতুলনীয় সম্পদ হয়ে উঠেছে যেখানে একাকার হয়ে গেছে মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম। প্রকৃতি বিষয়ক নানা ঋতুর রবীন্দ্রসঙ্গীতে তিনি লক্ষ্য করেছেন তিনটি বৈশিষ্ট্য। সেগুলি হল—প্রকৃতি প্রেমে আদ্যন্ত রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য এবং কাব্যসঙ্গীতের প্রকৃতি যেন একান্তই বাংলাদেশের। দেশপ্রেম বিষয় গানের আলোচনায় শ্রীমতী স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের স্বদেশী গানের উল্লেখ করে বঙ্গভঙ্গের সময়ে রচিত স্বদেশচেতনামূলক রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্টতার দিকটি তুলে ধরেছেন।

হাস্যরসাত্মক গানের আলোচনায় গবেষক বলেন যে মূলত নাট্য প্রয়োজনে বা অনুষ্ঠানের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ হাসির গান রচনা করেছেন, আর এই গানগুলির আয়তনের স্বল্পতা সম্ভবত নাটকে ব্যবহৃত হবার জন্যই। এই গানগুলিতে কোন ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ নেই, রয়েছে শুদ্ধ হাসির পরিশীলিত মার্জিত রূপ, যেখানে রবীন্দ্রনাথ দেশ, সমাজ বা ব্যক্তি কাউকেই অক্রমণ করেননি। তাঁর মতে রুচিশীলতার জন্যই রবীন্দ্রনাথের হাসির গান প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব আর অনন্যতা নিরূপণে তিনি বলেছেন,

> ‘‘রবীন্দ্রনাথের গান যেখানে সর্বপ্রকার অলংকরণ বর্জন করে, সুরে ও বাণীতে সরলীকৃত রূপে অনুভাবের গভীরে সঞ্চারিত হয়ে যায়, সেখানেই তাঁর কাব্যগীতির চরম ও পরম সার্থকতা। গানগুলির সুর যদি অনবধানে কণ্ঠে গুণগুণিয়ে ওঠে, কথার চিত্রকল্প তাকে আশ্রয় করে তৎক্ষণাৎ শ্রোতার অন্তরে কথা ও সুরের অভিন্ন রসরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। এই সুর যেন ঠিক এই বাণীর অপেক্ষায় ছিল অথবা গানের কথাগুলি যেন এই সুরের মূর্ছনার

প্রতীক্ষায় ছিল মনে হয়। সামগ্রিকভাবে কথা ও সুরের মিলনের এমন এক নিটোল, পরিপূর্ণ রসবোধের আনন্দ রবীন্দ্রসঙ্গীতের আধার ছাড়া অন্য কোথাও মেলে কি?"[২]

'আলোচ্য গীতিকবিদের কাব্যগীতির তুলনাশ্রিত আলোচনা' অধ্যায়ে গবেষক রবীন্দ্রসমকালীন চারজন গীতিকবিদের কাব্যগীতির বিভিন্ন পর্যায়ের গানের (স্থায়ী অংশকে বাদ দিয়ে) তুলনাশ্রিত আলোচনার মাধ্যমেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর যে যে বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য গীতিকবিদের সুরধারা থেকে স্বতন্ত্র তা গ্রন্থে সংযোজিত পাঁচটি গ্রাফে উল্লিখিত গানগুলির রেখাচিত্রের মাধ্যমে সমালোচক তুলে ধরেছেন। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন সেগুলি হল—ক) ছুটের ব্যবহার (দূরবর্তী স্বরান্তরের সহসা আরোহন অবরোহন), খ) অর্ধমাত্রার সীমিত ব্যবহার, গ) একস্বরে একাদিক্রমে বহুমাত্রাব্যাপী স্থিতি, ঘ) স্বরের আন্দোলন অর্থাৎ মোটামুটি নির্দিষ্ট স্বরান্তরে সুরের কয়েক মাত্রাব্যাপী ক্রমিক ওঠানামা, ফলে একটি দোলায়িত ভঙ্গীর সৃষ্টি। (ঙ) সামগ্রিক সারল্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সমকালীন কাব্যগীতির তুলনামূলক আলোচনায় গবেষক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলা কাব্যগীতির যুক্তি নিষ্ঠ পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে, তা নির্দেশ করেছেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আল্পনা রায়ের—'আলাপ থেকে বিস্তার' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের মে মাসে। এই পর্বে আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়সূচিতে তিনটি মূল অধ্যায়ে নিবন্ধগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

১. রবীন্দ্রনাটকে গানের সুর, রক্তকরবী'র গান, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের ভাষা।

২. রবীন্দ্রনাথের গান ঃ গানের মুক্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ বর্তমান ও সম্ভাবনা,

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি ঞ্ব কিছু সমস্যা।

৩. আমার কুলায় ভরা রয়েছে গান, আলাপ থেকে বিস্তার, পরিশিষ্ট-রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষঙ্গ যন্ত্র প্রসঙ্গে।

গ্রন্থের ভূমিকার লেখনী থেকে জানা যায় যে নিবন্ধগুলি ১৯৮১ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতায়ন ১ম খণ্ড, দেশ, বহুরূপী ও টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত নিবন্ধগুলিতে তিনি রবীন্দ্রনাটকের গানগুলির কথা ও সুরের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে নাটকে ব্যবহৃত গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সচেতন পরিকল্পনা ছিল এবং পরিকল্পনা নাট্যগঠনের সঙ্গেই যুক্ত। সমালোচকের মতে নাটক বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র গান হিসেবেও রবীন্দ্রনাটকের গানগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাটকে গানের প্রাচুর্য থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত। অধ্যাপক রায় মনে করেন, 'অচলায়তন'-এর 'দূরে কোথায় দূরে দূরে', 'রাজা'র 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' গানের সুর নাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যাপূর্ণ, আবার 'তপতী' নাটকের বিপাশার গানও যেন মূল্যহীন। তাঁর মতে এ ধরনের গানগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও নাট্যগতি স্তব্ধ করে অতিরিক্ত প্রাধান্য অর্জন করতে চায় না, গানগুলি নাট্যসংলাপের পাশাপাশি এক নতুন প্যাটার্ন বুনে চলে। 'রক্তকরবী'র গান নিয়ে পর্যালোচনায় তাঁর মতামত হলো, এখানে গানগুলি চরিত্রানুগ হয়ে নাটকে ক্রমশ অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে আর বাঁধা পড়েছে যেন অনিবার্য অন্তরঙ্গতায়, এ নাটকে নাট্যকার জাগতিক ঘটনা ও সুরময় অনুভবের দুটি ভিন্ন স্তরকে একই সূতোয় মিলিয়ে সংগ্রামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে বেঁধে দিতে পেরেছেন গানের ব্যঞ্জনায়। আমরা জানি যে গানেরই আছে সেই আশ্চর্য ক্ষমতা যা নির্দিষ্টতাকে স্বীকার করেও অনির্দেশ্যে মুক্তি দিতে পারে আর সত্য করে তুলতে পারে নিবিড়

বেদনা ও গানের সৌন্দর্যকে। গবেষকের মতে 'রক্তকরবী'র 'বিশু' ব্যথার মধ্যেই ভালবাসাকে চিনেছে, আর তাই তাঁর গানেও প্রেমের জগত হয়ে ওঠে বেদনাময়। 'নন্দিনী'কে পায়নি 'বিশু', সে ব্যাথাকে কখনোই বলা যায় না ব্যর্থতার বিলাপ। গানেই যেমন সে ব্যথিত চিত্তকে উন্মুক্ত করেছে, তেমনি গান বলেই তা বাঁধা থাকেনি ব্যক্তিগত দুঃখসীমায়। আবার তিনি বলেন যে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি 'রক্তকরবী'র 'থীম্ সঙ্', বাউলাঙ্গ সুরের গোটা গানটি এক সহজ খুশির আবহ রচনা করে তোলে নাটকে। পৌষ প্রকৃতির ডালা ভরে উঠেছে শষ্যসম্ভারে, প্রকৃতির এই আনন্দের বার্তা রয়েছে গানটিতে সুসম্পূর্ণ প্রয়োগে।

'রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের ভাষা' প্রবন্ধে লেখক বলেন যে চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা কে ঠিক একজাতের রচনা বলা যাবে না, অন্তত ভাষার বিচারে। 'চিত্রাঙ্গদা' এবং 'শ্যামা'র ভাষা কাব্যধর্মী, তুলনায় 'চণ্ডালিকা'র ভাষা নিরাভরণ, গদ্যময়। তাঁর মতে, জীবনের শেষপর্বে সুরের ভাষার উপরেই রবীন্দ্রনাথের নির্ভরতা, তখন কবিতার ভাষা নৃত্যনাট্যে গানের ভাষা হয়ে দেখা দিয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা'র ভাষা তাদের পূর্বরূপের চেয়ে বেশি কবিত্বময় হয়ে উঠেছে, 'চণ্ডালিকা'র ভাষা হল চরিত্রের অনুরূপ। গবেষক লক্ষ করেন যে নৃত্যনাট্যে গানের তাল এবং লয় অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে নৃত্যছন্দের সঙ্গে, কখনো তালবিহীন কথোপকথনের ছন্দও নৃত্যনাট্যে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে কেবল গান বা নাচের সৌকর্যের কারণে নয় নাট্যশিল্পের দাবীতে। এই তাল এবং লয়ের বৈচিত্র্য যেন উত্তর-প্রত্যুত্তর সম হয়ে উঠেছে নৃত্যনাট্যে। 'চণ্ডালিকা'র গানগুলি তালে বাঁধা থাকলেও তার অনেক গান বাঁধা তালের বাইরেই প্রকৃত নাট্যসৌন্দর্য লাভ করেছে। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে রয়েছে জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-সংঘাত-উত্তরণের তীব্র উপস্থিতি, তবুও তথাকথিত বাস্তবজীবন থেকে প্রাত্যহিকতার করস্পর্শমুক্ত হয়ে জীবনের গভীর সত্য ধরা দিয়েছে

নৃত্যনাট্যের গানে ও নৃত্যে। গানের সংলাপ আর নৃত্যের অভিনয় দুয়ের সম্মিলনেই রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য ভারতীয় সংস্কৃতিতে অভিনব। শ্রীমতী রায় বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের পরিণত গানকে কথা ও সুরের যোগ্য মিলনে যদি বলা হয় 'ইস্থেটিক্', তাহলে রবীন্দ্রনাথের অন্তিম জীবনের নৃত্যনাট্যও কথার ভাষা, সুরের ভাষা ও নৃত্যের ভাষার অন্তরঙ্গ মিলনে হয়ে উঠেছে নাট্যচর্চার সার্থকতম নান্দনিক প্রকাশ। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের গান রচনায় কথার ভূমিকাই ছিল বড়। ওস্তাদি গান রচনার কোন বাসনা ছিল না রবীন্দ্রনাথের, তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন বাংলা তথা বাঙালির যোগ্য গান। গবেষকের মতে আত্মপ্রকাশের আনন্দে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে মুক্ত করেছেন নির্বিচার আনুগত্য থেকে। সুরের মুক্তির সাথে তালের মুক্তিও চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে নতুন তাল সৃজনের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের মুক্তি ঘটিয়েছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে মুক্ত করে আনতে চাইছিলেন হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের কথার তুচ্ছতা আর বাংলা গানের চেনা জগৎ থেকে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সঙ্গীতের আশ্চর্য সুন্দর মুক্তি ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের তিনটি নৃত্যনাট্য রচনার মধ্য দিয়ে। নৃত্যনাট্যের সুরময় সংলাপগুলি স্পষ্টতই গান, যেকানে কবিতার মতো গতিই এ গানের শক্তি, আর এর মুক্তি ও এখানেই। সঙ্গীতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্ম উন্মোচনের উপায়ও এই গান। কখনো কথা দিয়ে, কখনো সুর দিয়ে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খার অন্তরালে কথা ও সুরের মিলিত ভুবনের যে প্রত্যাশা ছিল রবীন্দ্রনাথের, স্তরে স্তরে তা সম্পন্ন হয়েছে রচনায়। রবীন্দ্রনাথের গান ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে একটি ভাষা, কবিতার চেয়েও প্রগাঢ় তীব্র আবেদনময় ভাষা, যা কবির আত্মমুক্তির শ্রেষ্ঠতম ভাষ্য রূপে ধরা দিয়েছে।

এই গ্রন্থের আলোচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা, বর্তমান ও ভবিষ্যতে এ

সঙ্গীতের অবস্থান এবং স্বরলিপি সংক্রান্ত নানা সমস্যাসমূহকে উপস্থাপিত করে শ্রীমতী রায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার কারণ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সম্বন্ধে এক একজনের ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন, তাই গানের ভঙ্গীও ভিন্ন হবে। তবে শিল্পীর কাজ হল কথা ও সুরে অখণ্ডভাবে সত্যরূপে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন যে গানের লয়, তালছাড়া গান, নৃত্যনাট্যের গান ইত্যাদি গাইবার পদ্ধতি গায়ককে নিজেই গান গাইবার সময় ঠিক করে নিতে হবে। লেখিকার ভাবনায় এখানে উঠে এসেছে গায়কীর প্রসঙ্গ যা রবীন্দ্রসঙ্গীতে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আর অভিজ্ঞতা লব্ধ গায়কের রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বাধীনতার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন গবেষক। গ্রন্থভুক্ত 'আমার কুলায় ভরা রয়েছে গান' স্মৃতিবিজড়িত নিবন্ধে লেখক বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বিশেষজ্ঞ শান্তিদেব ঘোষের একটি অনুষ্ঠানে গীত গানের গায়কীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা সুর তাল লয় ও ভাবের মিলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে ভারতীয় রাগরাগিনী কীভাবে উপন্যাসের পরিবেশ রচনায় সহায়ক হয়ে উঠেছে শঙ্খ ঘোষের এ আলোচনাকে 'আলাপ থেকে বিস্তার' নিবন্ধে স্থান দিয়ে সমালোচক উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রমননে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগরাগিনীর অবস্থান। লেখক লক্ষ করেছেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসে সুর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, সে সুরে আনন্দের চেয়ে বিষাদ ব্যথাই বেশি রণিত হয়েছে। আর এই বিষাদ ব্যথার যোগ্য মাধ্যম এস্‌রাজ। লেখকের মতে যেখানে আনন্দ সে-ও এত নিভৃত এত একান্ত এবং গহন যে তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গভীর বেদনা, আর তার যোগ্য প্রকাশ হতে পারে যেন এস্‌রাজেই। গবেষকের কাছে ধরা দেয় যে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে 'কুমু' সংসারের মিথ্যা বন্ধন থেকে, দাম্পত্যজীবনের গ্লানি অপমান থেকে মুক্তি চেয়েছে। যাবার দিনে বিপ্রদাস আর কুমু এসরাজে বাজিয়েছে ভৈরবের আলাপ, যা গভীর শান্ত সকরুণ। বিপ্রদাস

কুমুকে সঙ্গীতের সত্য বুঝতে শেখায়, যে সত্য ঢেকে দেয় সমস্ত সাংসারিক অমিল ও বেসুর, যার অনুভবে ঘটে আত্মমুক্তি। লেখিকার মতে রবীন্দ্রনাথের দুঃখবোধের মধ্যে নেই কোনো ব্যর্থতার হাহাকার কিংবা নৈরাশ্যময় আত্মধিক্কার, নেই কোনো অমঙ্গলবোধ বা ট্যাজিক চেতনা। বরং আছে হয়ে ওঠা, হয়ে উঠতে চাওয়া, আছে আত্ম-আবিষ্কার, আছে জীবনের প্রগাঢ় উপলব্ধি, অনিঃশেষ অমৃতত্বে অবিচলিত বিশ্বাস। লেখিকা বলেন যে রবীন্দ্রনাথের গানে দুঃখের এই মহিমাকে বিপর্যস্ত করে না কোনো কাতরতার ছবি। তাঁর মতে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ তাঁর 'দুখের আলো', 'দুখের মাধুরী' শব্দগুলোর জন্য। লেখিকার ভাবনায় ধরা দেয় দুঃখে উত্তীর্ণ হবার সূত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়ে গেছেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে।

গ্রন্থে পরিশিষ্টে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট এস্রাজ শিল্পী ও শিক্ষক 'রণধীর রায়' এর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষঙ্গ যন্ত্র প্রসঙ্গে' নিবন্ধটি সংযোজন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে যন্ত্রানুসঙ্গের ব্যবহার সম্পর্কে একটি পথনির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ ভাবনা যখন নানাজনের চিন্তার বিষয় তখন সমালোচকের লেখনীতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগরাগিনীতে জারিত আপন বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যতে বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য গানের পাশে বেঁচে থাকার আশ্বাস বাণী শোনা যায়। শ্রীমতী রায় বলেন,

> '''রবীন্দ্রনাথের গান' 'নিজের' হয়ে ওঠে শিল্পীর বিরামহীন আত্মরচনার মধ্যে, অনুশীলনের শ্রমে নয় কেবল, তার সঙ্গে উপলব্ধি ও মননের নিরন্তর যোগে যিনি গানের সত্যমূল্য চিনে নিতে পারেন তিনিই পারেন শ্রোতাকে দীক্ষিত করতে, পারেন রবীন্দ্রসঙ্গীতকেও আত্মসৃষ্টি করে তুলতে। রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে যায় শিল্পীর গান, আর সেইসঙ্গে

হয়ে ওঠে শ্রোতারও গান, এই ত্রিমাত্রিক ভুবনেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঘটে পূর্ণতা। শিল্পী ও সংবেদনশীল শ্রোতার এই মিলন যত অন্তরঙ্গ হবে, পরস্পরের দেওয়া নেওয়া সাধনা যত এক হয়ে মিলে যাবে, তত উন্মুক্ত হবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনন্ত সম্ভাবনাময় জগৎ। বর্তমানের কাজ সেই সম্ভাবনার অন্বেষণ।"[৩]

সাহিত্যের সুপরিচিত অধ্যাপক, সঙ্গীত শিল্পী ও গবেষকের গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক ভাবনা রবীন্দ্রানুরাগীদের নিঃসন্দেহে ঋদ্ধ করে চলেছে।

সুধীর চক্রবর্তীর 'নির্জন এককের গান রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রকাশিত হয় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থের বিষয়সূচি নিম্নরূপ—

১। রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ তথ্য ও তত্ত্ব ১৯৬১-১৯৮৬, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ নানা মনের চোখে।

২। 'রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে', 'সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান।'

৩। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঞ্চারী।

১৪৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থে বিশিষ্ট সমালোচক পাঁচটি নিবন্ধকে তিনভাগে বিভক্ত করে বিন্যাস্ত করেছেন। গ্রন্থারম্ভে লেখক জানিয়েছেন যে, এই নিবন্ধগুলি গ্রন্থভুক্ত হবার পূর্বে নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধটিতে রয়েছে ১৯৬১ থেকে ১৯৮৬ অর্থাৎ রবীন্দ্র শতবর্ষ থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছরে প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ, গবেষণা গ্রন্থ ও এছাড়া কিছু মৌলিক ও সংকলিত গ্রন্থের বিষয় নিয়ে লেখকের পর্যালোচনা।

লেখকের সমীক্ষায় উঠে আসে যে শান্তিদেব ঘোষ লিখিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' নামক গ্রন্থটি বাংলাভাষার রবীন্দ্রগীতি বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। আরেকটি বিশেষ তথ্য হল রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে গবেষণার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, যিনি মোটেই গানের জগতের লোক ছিলেন না। এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গবেষণার ইতিহাসে অবশ্যই জানা দরকার। লেখকের সমীক্ষায় আরো জানা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম দুই গবেষক (গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের দিক দিয়ে) হলেন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু ও অধ্যাপক প্রণয় কুমার কুণ্ডু। লেখক গ্রন্থ পর্যালোচনায় তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি গ্রন্থের ভাল লাগা, অপছন্দের দিক তুলে দিয়ে নতুন গবেষকদের পথ সুগম করে দিয়েছেন। পরবর্তী প্রবন্ধে লেখক বিভিন্ন ব্যক্তির ভাবনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল্যায়ন করেছেন। এই মূল্যায়ণে কারখানাগামী যুবক থেকে স্বদেশী করা বৃদ্ধ, প্রগতিবাদী থেকে ধার্মিক, সাহিত্যিক, কবি ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের মানুষের বয়ানে বা উপলব্ধিতে লেখক প্রতিপন্ন করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ছুঁয়ে যায় কোনও না কোনও ভাবে সকলকেই। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো,

> ''এ আমাদের সগর্ব ঐতিহ্য নয় কেবল, বরং প্রতিদিনের নিত্যজীবিত তর্কবহুল অর্জন। ... এ গান আমাদের ভালাবাসার উজ্জীবনের, অস্তিত্বের।''[৪]

বিদগ্ধ সমালোচক রবীন্দ্রনাথের হাতে কীভাবে বিষয়হীন থেকে বৈভবপূর্ণ অবস্থানে বাংলা গানের উত্তরণ হল তা রবীন্দ্রপূর্ব ও সমকালীন বাংলা গানের ইতিহাসের পটভূমিতে সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন, 'রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে' নিবন্ধটিতে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়ী উক্তি 'সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান' শিরোনামের প্রবন্ধতে রবীন্দ্রগানের ভবিষ্যত নিয়ে গবেষক আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে

রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ও সর্বত্রগামী হয়নি। এ বিষয়ে লেখকের মতামত সমর্থন করে বলতেই হয় যে গীতবিতানের বিপুল সংখ্যক গানের মধ্যে দশ থেকে তিরিশ শতাংশ গানই ঘুরে ফিরে ব্যাপকভাবে সুপরিচিত। যার ফলে বাকী রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা থেকেই যায়। যদিও স্বরলিপি রয়েছে অশ্রুত গানের, কিন্তু স্বরলিপি তো গানের গায়কী সম্বলিত মাধুরী দিতে পারে না। আবার প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা বিশেষ করে (আগের যুগের তুলনায়) অধুনা শিল্পীরা তো শ্রোতার কথা ভেবেই নিজেদেরকে নিজেরাই কৃপণ করে রাখছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী যাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ শিক্ষা রয়েছে, তাদের কাছেই এ সব গানের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভরশীল। লেখক যথার্থই বলেছেন যে তরুণ প্রজন্ম যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসেন তারাও কিন্তু কে ঠিক্‌ঠাক্ গাইছেন বা এ প্রজন্মের কাদের গান শুনলে ভালো তারও খোঁজে রাখেন না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শহর, শহরতলীর অগণিত প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা হচ্ছে, এগুলোকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। আর এই চর্চার মধ্য দিয়েও যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে রয়েছেন, তাদেরকে শোনবার জানবার উৎসাহ না থাকলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাতো থাকবেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে লেখকের অন্য মতামত হল যথার্থ শিক্ষণ। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর, গায়কী, মেজাজ সংরক্ষণ করতে গেলে অবশ্যই যোগ্য শিক্ষক ও যথার্থ শিক্ষণের আদর্শ থাকা চাই।

রবীন্দ্র পূর্ব, রবীন্দ্রকালীন গান আর গীতিকবিদের গানের গঠনে যেখানে 'সঞ্চারী'র বিশেষ ব্যবহারই হয়নি, সে জায়গায় বাংলা গানে স্বল্প ব্যবহৃত 'সঞ্চারী' রবীন্দ্রনাথের গানে আত্মপ্রকাশ করে গানকে সুরগত, ভাবগত, ভাষাগত সবদিক থেকে অনন্য করে তুলেছে তা-ই লেখক তাঁর 'রবীন্দ্র গানে সঞ্চারী' নিবন্ধে সুন্দর বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন। লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথের গানে আদিপর্ব থেকেই

কলিগঠনে সঞ্চারীর আবির্ভাব ঘটলেও 'গীতাঞ্জলি' পর্বেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'সঞ্চারী'র সুনির্দিষ্ট দ্যোতনা জেগে উঠেছে সুরে আর ভাবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানা ধরনের কলিগঠন বিন্যাস, সুরের বিন্যাসের উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধটিকে লেখক তাঁর মৌলিক ভাবনা সমৃদ্ধ রচনা হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। লিখেছেন—

> "... সঞ্চারীর মধ্যেই সঞ্চারিত থেকে যায় রবীন্দ্রগানের বীজপত্র। আমরা শুধু দেখতে পাই পুষ্পপল্লব পরিকীর্ণ সম্ভার।"[৫]

রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার বিপুল ভাণ্ডারে এই গ্রন্থটি অনন্য বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ।

।। তিন।।

সুধীর চন্দ-র 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ঞ্জ রাগ-সুর নির্দেশিকা' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। আমাদের সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটি ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত সংস্করণ। ২১৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির বিষয়সূচিতে রয়েছে---রবীন্দ্রসঙ্গীত রাগ নির্দেশ ভাবনা ঞ্জ পরিপূরক বক্তব্য, প্রথম অধ্যায়—রবীন্দ্রসঙ্গীত-রাগ ও তাল বিজ্ঞাপিত বর্ণানুক্রমিক সূচি। দ্বিতীয় অধ্যায়-রবীন্দ্রসঙ্গীত-রাগানুসারী এবং কীর্তন, বাউল ও অন্যান্য সুর বিভাগ। তৃতীয় অধ্যায়-অপরাপর রচিত গীতিকবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রযুক্ত সুর এবং বেদমন্ত্রে ও বৌদ্ধমন্ত্রে রবীন্দ্রসুর। চতুর্থ অধ্যায়- স্বরবিতান'র যে রাগ নামে বিভ্রান্তির অবকাশ। পঞ্চম অধ্যায়-অধ্যাবধি সুরসন্ধানহীন এবং সুরসন্ধান জ্ঞাত কিন্তু অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত। ষষ্ঠ অধ্যায়—রবীন্দ্র সৃষ্ট তালের গান ও তালের বোল। সংযোজন

১- রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিকার। সংযোজন ২- রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি যে সকল সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ ব্যবহার নিয়ে অনেক গবেষকই তাঁদের ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সুধীর চন্দের সংকলিত গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় সুরারোপিত গানের রাগ নির্দেশের একটি অসাধারণ সম্ভার। গ্রন্থ জুড়ে রাগানুসারি, কীর্তন, বাউল ও অন্যান্য সুরাশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা, স্বরবিতানভুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিকারদের পরিচয় সহ তাঁদের সম্পাদিত স্বরলিপি সম্বলিত গ্রন্থের তথ্য ইত্যাদি গ্রন্থটির মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রন্থে উল্লিখিত তালিকার মধ্যে দিয়ে গীতবিতানের প্রত্যেকটি গানের রাগ, তাল, সুর, স্বরলিপিকার ইত্যাদি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। লেখকের বক্তব্যে রয়েছে,

> "... রাগভিত্তিক সুর সংগঠনের সঙ্গে কীর্তন-বাউলের কাজ বা অলংকার ওতপ্রোত মিশ্রিত করে দেওয়াই রবীন্দ্র-গীতরূপের বিশেষত্ব—এই প্রয়োগই হয়ে ওঠে গায়কী। রবীন্দ্রনাথের সুর, প্রত্যয়ের সঙ্গে রাগপর্যায়ের মাটিতে পা রেখে চলেছে কীর্তন বাউলের অলংকার ছন্দ বাজিয়ে। ... কবির প্রিয় রাগগুলি.. কবির হাতের গড়নে এদের নিজ নিজ গঠন-প্রকৃতি এক অন্তর্লীন সামঞ্জস্য পেয়েছে, গানের সুর-সমাবায়ে যা একটি বিশিষ্ট চরিত্র সঞ্চারিত করে দেয়। এই বিশিষ্ট চরিত্রই রাবীন্দ্রিকতা।"[৬]

রাগাশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিসংখ্যানে তিনি দেখিয়েছেন, ভৈরবী সুরে বা আংগিকেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি গান রচনা করেছেন, আর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট তালানুসারী গানের পরিসংখ্যানে প্রথম স্থানে রয়েছে ষষ্ঠীতাল বা ২/৪ ছন্দ। লেখকের

মতে প্রায় ৫০টি গান রয়েছে ষষ্ঠীতালে—যার মধ্যে ৩টি মাত্র পূজা পর্যায়ে আর বাকীগুলি প্রেম ও প্রকৃতির। কবির শেষজীবনের রচনায়ই ষষ্ঠী প্রযুক্ত হয়েছে বেশি করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চায় এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অন্যতম নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ।

।। চার।।

লীলাশ্রী বসুর 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। আলোচ্য গ্রন্থের সূচিতে রয়েছে—'কে গো অন্তরতর সে', 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে', 'প্রাণের পরে চলে গেল কে', 'তোমায় আমায় মিলে', 'রূপকল্প চেতনা কথায় ও সুরে', উপসংহার। গ্রন্থের মূল পাঁচটি অধ্যায়ের চারটি অধ্যায়কেই লেখিকা নামাঙ্কিত করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের পংক্তি দিয়ে। এই গ্রন্থের ভূমিকা সুচিত্রা মিত্রের লেখনীতে ভূষিত। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত লেখনীর মধ্যে শ্রীমতী বসু রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্য ও সুরের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কবির নিভৃত প্রাণদেবতার অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

লীলাশ্রী বলেছেন,

> ''মানুষের পরিবেষ্টনের চারপাশের সামাজিক জগতের ভাষা সীমিত অর্থ এবং স্বার্থ দিয়ে বাঁধা। সঙ্গীত এই বন্ধনকে মুক্তি দেয়। সেই মুক্তির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানে যে নিভৃত প্রাণের দেবতার মধ্যে আশ্রয় চাইছেন আর এক রবীন্দ্রনাথ, কখনও নারী, কখনও পুরুষ, কখনও

প্রকৃতি আবার কখনও দেবতারূপে—অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে—যাঁর অধিষ্ঠান তাঁর হৃদয় পুরে।”[৭]

গ্রন্থের প্রতিটি নিবন্ধে রবীন্দ্র কাব্য-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ বিশেষ করে গানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষকের অনুসন্ধান চলেছে রবীন্দ্রসৃজনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিভৃত প্রাণের দেবতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন কি না। সেই সত্যকে ধরতে গিয়ে সমালোচকের বক্তব্য হল,

> ‘‘এই অনুসন্ধানের নিরন্তর প্রবহমান গতি তাঁর গানের এক বিশিষ্ট পর্যায়—যাকে প্রেম ও পূজা দিয়ে কৃত্রিমভাবে ভাগ করা যায় মাত্র। আসলে নির্জন নিভৃত প্রাণদেবতাকে খোঁজা যেন এক অখণ্ড গীতিময় কবিসত্তার অশেষ অনুসন্ধান। আর সমগ্রভাবে এই নিয়ত গতিশীল ধারাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।”[৮]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবাদর্শের আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যেও অখণ্ড ভাবনায় ধরা দেয় তার প্রকাশ নৈপুণ্য।

।। পাঁচ।।

অপূর্ব বিশ্বাস রচিত ‘ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র-কবিমানস’ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে। এই গ্রন্থের সূচিপত্রে রয়েছে—ভূমিকা, প্রথম পরিচ্ছেদ-গ্রীষ্ম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-বর্ষা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ-শরৎ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ-হেমন্ত, পঞ্চম পরিচ্ছেদ-শীত, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-বসন্ত, উপসংহার, পরিশিষ্ট-ঋতুসঙ্গীতের

তালিকা, গ্রন্থপঞ্জী।

গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপিকা নীলিমা সেন। এটি একটি গবেষণা গ্রন্থ। এই গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র কবিমানসের অনুসন্ধান। গীতবিতানের প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলির বিষয়গত ও ভাবগত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখক অনুসন্ধান করেছেন প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে। গবেষক গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত ছয়টি ঋতুর গানের আলোচনায় বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গ্রীষ্মের গানগুলি বহুমুখী বিষয় ও ভাবনার বৈচিত্র্যে অসামান্য কাব্যরূপ লাভ করেছে। গানগুলি কেবল বহিঃপ্রকৃতির চোখে দেখা সাধারণ রূপ হয়ে থাকেনি, আমাদের সমস্ত অনুভূতিকেও জাগিয়ে তুলেছে। গ্রীষ্মের অন্তঃপ্রকৃতির সাথে এক যোগাযোগের সূত্রও উন্মোচন করে দেয় গানগুলি। গবেষক এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> ‘‘গ্রীষ্মের গানের রূপচিত্রনে বার বারই রহস্যের ধূসরতা পরিব্যাপ্ত হয়েছে, যা চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। তাই সংখ্যায় স্বল্প হলেও গ্রীষ্মের গান ব্যপ্তিতে এবং গভীরতায় অনুপম।’’[৯]

তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে খুঁজে পাওয়া যায় বিচিত্র অনুষঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গত বিন্যাসের মহিমা, যা শুধু গভীর স্পর্শীই নয়—অভিনব, বিচিত্র এবং অনন্য। বর্ষার গানের সুরসৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথ অসামান্য অনন্যতার পরিচয় রেখেছেন। লেখকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বর্ষার গানের সুরসংযোজনায় কবি এনেছিলেন বিস্ময়কর অভিনবত্ব এবং বৈচিত্র্যময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ। কবি যেমন প্রচলিত প্রথা ভেঙেছেন, তেমনি নূতনতর সুর সৃষ্টিতে তাঁর গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। গবেষকের বক্তব্যে হলো,

> ‘‘একদা যৌবনে ছিন্নপত্রে চিঠিতে মেঘমল্লারে বর্ষার গান লেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন ‘নিত্যনতুন আবেগ, অনাদি অনন্তবিরহ বেদনা’। তা-ই সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা আর অনুভবের মধ্যে দিয়ে কীভাবে চলে এসেছে তাঁর গানের কথার মধ্যে, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি কবির শেষ বয়সের বর্ষার গানগুলির মধ্যে, যা কেবল ঋতুসঙ্গীত বা বর্ষাসঙ্গীত হয়েই থাকবে না, হয়ে উঠবে তাঁর সমস্ত জীবনের অর্জন আর উপলব্ধির গান।”[১০]

গবেষক শ্রী বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের শরত ঋতুর গানে খুঁজে পান আশ্চর্য বৈচিত্র্য, গভীরতা এবং সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা, যা তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সমালোচক বলেন ,

> ‘‘প্রকৃতির আঙিনায় ক্ষণিকের অতিথি শরৎ তার স্বল্পাবকাশের স্বর্ণরাগ রেখে ও শিশিরশিহির তৃণভূমিতে মুঠো মুঠো শিউলি ফুল ছড়িয়ে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই বারে বারে ধরা পড়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে আর বাণীর ঐশ্বর্যে, ঋণশোধের তত্ত্বে, সৌন্দর্যের আশ্চর্য বিস্তারে। কবির সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে অতিক্রম পর্ব পর্যন্তই শরৎ ছিল তাঁর সঙ্গী।”[১১]

হেমন্ত ঋতুর গান রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভান্ডারে স্বল্প হলেও লেখক বলেছেন যে সেই স্বল্পতা কিন্তু দায়মোচনের অগভীরতা বা শীর্ণতা নয়। রবীন্দ্রনাথ হেমন্তের অন্তঃস্বভাবকে চিনতে পেরেছিলেন জীবনবিকাশেরই সামূহিকতায়, তবে রবীন্দ্র

কবি-মানসে এর প্রকাশের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত নয়। লেখকের মতে,

> ''শীতের গানের মূল তত্ত্বটি সেই 'ফাধনী' নাট্যেরই ভাবনা—শীতের শীর্ণতার মধ্যে দিয়ে বসন্তের প্রকাশনা। তারই সূত্র ধরে গানগুলিতে এল অনুভূতির নানাচারী বিন্যাস, ভাবনার উপবৃত্ত, মাত্র ১১টি গান হলেও শীতঋতুর অন্তঃস্বভাবী চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে আবিস্কার করতে সমর্থ হয়েছেন।''[১২]

লেখকের অনুসন্ধানে রবীন্দ্রগানের 'প্রকৃতি' পর্যায়ের ভাণ্ডারে 'বসন্ত' ঋতু আশ্চর্য সংবেদনা ও বহুমাত্রিক চেতনায় বিকশিত, বসন্তের গানে রয়েছে বৈচিত্র্যময় নান্দনিকতা। সুর সংযোজনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানে আছে অভিনবত্ব। বাণীর গভীরতা, বিষয়বৈচিত্র্যের পাশাপাশি কবি এনেছেন ভিন্নতা, ঘটিয়েছেন মিশ্রণ। বর্ষার মল্লার, হেমন্ত কিংবা শীতের হাম্বীর প্রভৃতি ভিন্ন ঋতুর রাগেও রবীন্দ্রনাথ বেঁধেছেন বসন্তের গান। গবেষকের বক্তব্য হলো,

> ''বসন্ত দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা নিয়েই কবির চেতনায় ধরা দিয়েছিল জীবনের সমান্তরাল এক শক্তি হিসেবে। সেই সঙ্গে বসন্তের যৌবনময় পথিক সত্তা, প্রেমিক সত্তা নিয়ে এসেছে অন্তর্লীন এক নাটক। আবার এই জীবন সংলগ্নতার জন্যেই বসন্ত কখনো হয়েছে গতি ও মুক্তির প্রতীক, কখনো অনিঃশেষ আত্মদানের আবেগে অপরাজেয়। আর এই বিষয় ও ভাবের বহুমুখিনতা শেষ পর্যন্ত সমন্বিত হয়েছে সংহত নিবিড় এক মানসিক প্রাপ্তির অভিজ্ঞানে সেই নিবিড় অর্জনের বৈভবেই রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়েছে।''[১৩]

রবীন্দ্রনাথ মানবজীবন ও নৈসর্গিক ঋতু বৈচিত্র্যের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন একটি অন্তর্লীন সম্পর্ক, নিজের কবি সত্তাকে নিসর্গ প্রকৃতির সত্তার সাথে বিলীন করে দিতে পেরেছিলেন বলেই কবির ঋতুসঙ্গীতগুলির জীবন্ত ও অসামান্য নান্দনিকতায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাই গবেষক বলেছেন,

> ‘‘প্রাকৃতিক ঋতুরঙ্গের সঙ্গে মানুষের এই যোগস্থাপনের সাধনাই প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবন ব্রত... নিজের অস্তিত্ব বোধকে ঋতুসত্তার গভীরে বিলীন করে দিয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্র রচিত ঋতুসঙ্গীতগুলি আমাদের অন্তরের অনুভূতির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে যায়। প্রতিটি ঋতুর নৈসর্গিক রূপ বিভঙ্গে আমরা আমাদের নিভৃত সত্তার আনন্দ-বেদনার যোগ্য প্রতিমান খুঁজে পেয়েছি। ... গানগুলির বিষয় বিন্যস্ত ভাবসম্পদ আলোচনার সময় দেখেছি বৈশাখী ঝড়, বাসন্তিক মত্ততা অথবা শারদমহিমা কেবল নিসর্গ প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ স্বাতন্ত্র্যে আসে না, মানব হৃদয়েও মত্ততা এনে দেয়, দোলা দেয়, জাগরণ ঘটায়।”[১৪]

গ্রন্থের পরিশিষ্টে লেখক প্রতিটি ঋতুর গানের সঙ্গে অন্য পর্যায়ে নানা ঋতুর অনুষঙ্গ সম্বলিত গানের তালিকা সংযোজন করে রবীন্দ্রানুরাগীদের সামনে উপস্থাপন করেছেন কীভাবে অন্য পর্যায়ের গানের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম অবিষ্ট হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা গ্রন্থের সমীক্ষার নিরিখে প্রকৃতি বিষয়ক গান সম্পর্কে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে পরবর্তী গবেষকদের ভাবনাকে ঋদ্ধ করবে।

।। ছয়।।

গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল-এর 'রবীন্দ্রকাব্যসঙ্গীত সমীক্ষা ও সংকলন' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়সূচি এভাবে রচিত হয়েছে— ভূমিকা, সূচনা, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী' ও 'সোনার তরী', 'চিত্রা ও কল্পনা', 'ক্ষণিকা' 'বলাকা' 'পূরবী', 'মহুয়া', 'বীথিকা' ও 'সানাই'। পরিশেষ ও সংযোজন।

১৪২ পৃষ্ঠার গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে এই গ্রন্থে আলোচিত গানগুলি অধ্যাত্মচেতনার গান নয়। লেখকের মতে,

> ''রবীন্দ্রকাব্যসঙ্গীত একান্তই মানবিক সান্নিধ্য ও অনুরাগের গান। ... রবীন্দ্রকাব্যসঙ্গীত বলতে মনে করি সেই গান যা একান্তই ইন্দ্রিয়ানুগ সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত আবেগময় প্রেমের সংহত অভিব্যক্তি।''[১৫]

রবীন্দ্রকাব্যসঙ্গীতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে থেকে মোট ১২টি কাব্যগ্রন্থভুক্ত গান নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। এই আলোচনায় তাঁর নির্বাচিত কাব্য তালিকার মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রকাব্য ধারায় পরিবেশ-পটভূমি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভাব ও প্রকাশ রীতির পরিবর্তন। লেখক কাব্যসঙ্গীতের এই আলোচনায় আধ্যাত্মিক ধারার 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য'কে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে কী আধ্যাত্মিক ভাব কাব্যে তথা সঙ্গীতে এলে তা কাব্যসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না? এ ব্যাপারে স্বভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে। 'বাউল' কাব্যগ্রন্থেও লেখক আধ্যাত্মিক বা ভক্তিরস

খুঁজে পেয়েছেন। অথচ ১৯০৫ অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'বাউল' এর প্রতিটি গানে আত্মবোধে উদ্দীপ্ত হবারই কথা রয়েছে। বর্তমানে 'বাউল' এর গানগুলি বেশিরভাগই গীতবিতানের স্বদেশ পর্যায় ভুক্ত। লেখকের নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থভুক্ত সঙ্গীতগুলির আলোচনায় উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে ভাব বজায় রেখে সুরের তাগিদে কাব্যের অদলবদলের কথা। যদিও রবীন্দ্রকাব্যসঙ্গীতে এ ধরনের রূপান্তরের কথা পূর্বের গবেষকদের হাত ধরে আমাদের আর অজানা নয়। আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত রবীন্দ্রকাব্যভুক্ত সঙ্গীতগুলির ভাব বিশ্লেষণ করে লেখক উপস্থাপিত করেছেন, যদিও তা একান্তই তাঁর নিজস্ব অনুভূতির ছোঁয়ার লেখা। আসলে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব সম্প্রসারণ তো আর স্থিতিশীল শিল্প নয়, তা ব্যক্তিবিশেষে পাল্টাবেই। তবুও লেখকের লেখনীতে গানগুলির ভাবনাকে খুঁজে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থাবলী নিয়ে লেখকের কিছু ভাবনা হল,

> '''কড়ি ও কোমলে' বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও সুস্পষ্ট। ... 'মানসী' ও 'সোনার তরী' এগুলি একান্তই প্রেমসঙ্গীত এবং সেই প্রেম প্রধানত মানবিক। ...'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ রোমান্টিক হলেও সুলভ রোমান্টিক নয়। অতি কোমল শিল্পকৃতিতে উজ্জ্বল 'মহুয়া'র কাব্যসঙ্গীত একান্ত মানবিক ও আবেগময় হয়েও বিস্ময়কর সংযমের সীমার মধ্যে অসীম সৌন্দর্যের আকাশ রচনা করেছে।"[১৬]

রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার সহায়ক বলে লেখক মনে করেন। লেখকের মন্তব্য,

> "... রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুশীলনের সঙ্গে মিলিত না হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বোধ সম্যক প্রখরতা লাভ

করতে অসমর্থ হয়। কারণ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাধনা ''বাণী বীনাপানির'' সাধনা।''[১৭]

এই গ্রন্থে আলোচিত রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থভুক্ত প্রেমসঙ্গীতের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই মূলত লেখকের লেখনীতে ধরা দিয়েছে।

কৃষ্ণা দাশগুপ্ত-র 'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। আসাম প্রদেশের গৌহাটী নিবাসী এই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষিকার অনুভবী লেখনী সমৃদ্ধ ১১১ পৃষ্ঠার গ্রন্থের প্রীতিবাক্ লিখেছেন খ্যাতনামা অসমিয়া কবি, নবকান্ত বরুয়া, যা বইটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। বিষয়সূচির তালিকামুক্ত সংগৃহীত এই গ্রন্থে 'অনুভবে আমি', 'মুক্তবন্ধন সপ্তসুর', 'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ', 'শান্তিনিকেতনী সুর', 'তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে', 'তোমারি নাম সকল তারার মাঝে', 'তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে', 'বড়ো বিস্ময় লাগে', 'যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি' শিরোনামে কয়টি ভাগে লেখক তাঁর ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। নানা কারণে সময়মতো ললিতকলার চর্চা করার সময় পাননি যাঁরা, তারা জীবনের গোধুলি বেলাতেও যাতে নিঃসংকোচে এ গান (রবীন্দ্রসঙ্গীত) শিখতে এগিয়ে আসতে পারেন—গ্রন্থ মধ্যে সেই আশ্বাস ও অভয়বাণীর বার্তা পৌঁছে দেবার বাসনা নিয়ে লেখক গ্রন্থটি রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

'মুক্তবন্ধন সপ্তসুর' নিবন্ধে শ্রীমতী দাশগুপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত জিজ্ঞাসুদের সঙ্গীত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। 'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ' লেখনীতে আসাম নিবাসী এই গ্রন্থকার সুরকার রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সুরসৃষ্টিতে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের নানা আঙ্গিক এর প্রকাশের কথা বলতে গিয়ে ' ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' রবীন্দ্রসঙ্গীতটির চলনে বিহু গানের ছন্দ ও ভাবের মিল খুঁজে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থী অনুভব, নিষ্ঠা ও বোধের

প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলে অথবা শিখতে হলে এমনকি শুধু বুঝতে, শুনতে হলেও... যা প্রয়োজন তা হলো সামান্যবোধ আর কিছুটা অনুভব করার শক্তি। ... এ বোধ অবশ্য সবার থাকে না। যদি জন্মক্ষণে কেউ তা পেয়ে থাকে—সে ধন্য। যে পায়নি, অনুশীলন করেও সে তা কিছুটা অন্তত আয়ত্ত করতে পারবে।''[১৮]

বহুবাহুল্য, প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব, আর রবীন্দ্রসঙ্গীত তার বিধিনির্দেশ দ্বারা আবর্তিত তাই আজও এই গান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাছে বাঁধনই এ গানের অলঙ্কার যা মেনে নিলে অন্যদিকে এই গানেও যে মুক্তির আনন্দ রয়েছে তা উপলব্ধি করা যায়।

কবি তাঁর গান নিয়ে যেভাবে কোন আপসের পক্ষপাতী নন, ঠিক এভাবে কবির মনোভাবকে মূল্য দেওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগীর কর্তব্য। এ কর্তব্য গায়ক ও শ্রোতা উভয়েরই। আর শ্রোতা এ সম্বন্ধে সজাগ হলে গাইয়েরাও বাধ্য হবেন যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের। কৃষ্ণা দাশগুপ্ত মনে করেন, একমাত্র এভাবেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষতি বা বিকৃতি রোধ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মোটামুটি সব উপদান নিয়েই আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রগানে সঠিক লয় নির্বাচনের কথায় 'আমি চঞ্চল হে' গানটি দ্রুত লয়ে হবে বলে শ্রীমতী দাশগুপ্ত মনে করেন। তিনি শুধু 'চঞ্চল' শব্দটিকে প্রাধান্য দিয়ে রুদ্ধদ্বারে চঞ্চল-এর উন্মাদনার দিকটিই লক্ষ করেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এই গানেই তো রয়েছে 'আমি উন্মনা হে... হে সুদূর আমি

উদাসী/রৌদ্র মাখনো অলস বেলায়'... ইত্যাদি। এই উদাসী আর অলসবেলার প্রকাশে কিন্তু গানটির লয় দ্রুত হতে পারে না। আসলে একটি গানের লয় গানের সম্পূর্ণ কাব্যভাবের সামগ্রিকতাকে গ্রাস করে তবেই ধরা দেয়। অতএব শুধু 'চঞ্চল' শব্দ দেখেই দ্রুত লয়ে গাইতে হবে এর কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে আমরা মনে করি না। এছাড়া 'আমি চঞ্চল হে' গানের প্রামান্য চলন সম্বন্ধেও আমরা জ্ঞাত বিশিষ্ট কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর গায়নে। এই গ্রন্থে লেখক তাঁর শান্তিনিকেতন, গীতবিতান সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ও পরবর্তীকালের সঙ্গীত জীবন এবং তাঁর সঙ্গীতজীবনে কাছে থেকে দেখা বিভিন্ন সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব তথা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাগুরুদের সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা সহজ কথায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে স্বরবিতানের প্রামান্য সুরের পাশাপাশি শান্তিনিকেতনে প্রচলিত কিছু কিছু গানের যে সুরান্তর রয়েছে, তাও সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয়া কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রের মতো শিল্পীদের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগীদের পথ নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সহ বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত জীবনের স্মৃতিবিজড়নের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত নানা বিষয় নিয়ে সরস ও সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী ও শিক্ষিকা তাঁর গ্রন্থে।

।। সাত।।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা গবেষণা চর্চার সমীক্ষায় এবারে যে গ্রন্থের আমরা উল্লেখ করব তা যথার্থ অর্থেই ব্যতিক্রমী। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর, গায়কী, ভাবের তত্ত্বকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র বিষয় সম্বলিত এই গ্রন্থটি সত্যিই এক বিশেষ পাওয়া।

গ্রন্থটি হলো, পুষ্পবিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত রচনা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে উদ্ভিদ ও ফুল'। প্রকাশকাল ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। রবীন্দ্রগানের কথায় নানা ধরনের ফুল আর উদ্ভিদের নাম জানা যায় ঠিকই, কিন্তু এই ফুল আর উদ্ভিদ জগতের অনেকাংশই থাকে অচেনা অজানা। এই গ্রন্থে শ্রীমুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে উল্লিখিত উদ্ভিদ ও ফুলের বৈজ্ঞানিক পরিচিতির সাথে গীতবিতানের বিন্যাস অনুযায়ী রবীন্দ্রগানে প্রত্যেকটির প্রয়োগ অপূর্ব সুন্দর ভাষায় সচিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক রথীন্দ্রনারায়ণ বসুর শংসাপত্রে শোভিত। গ্রন্থের বিষয় বিন্যাসে রয়েছে—অশথ-অশথ-অশ্বত্থ, অশোক (বঞ্জুল), আম (আম্র, আমুয়া), আমলকী (আমলকি), আমড়া, কচু, কদম্ব (কদম, নীপ), কনকচাঁপা, করবী, কাঞ্চন, কামিনী, কাশ, কাঁটালতা, কুসুম, কৃষ্ণকলি (সন্ধ্যাফুল, সন্ধ্যামালতী), কৃষ্ণচূড়া, কেয়া (কেতকী), গোলক চাঁপা, গোলাপ, চন্দন, চাঁপা (চম্পক, চম্পা), জবা, জাম, জুঁই জাতীয় ফুল, কুন্দ, চামেলি (জাতি), মূথী (মুঁথি)/জুঁই (যুঁই), বনমল্লিকা, বেলা (বেলি, বেল, বল্লিকা), মল্লিকা (মল্লি), মালতী (জুঁইজাতীয় ও অন্য প্রকার), ঝাউ, ঝুমকোলতা, তমাল (তমালী), তাল (তালী), দূর্বা, দোলনচাঁপা, ধান (আউষ), ধুতরো, নাগকেশর, নারিকেল, নীলশতদল (নীলপদ্ম), পদ্ম (শতদল, নলিনী, কমল), পলাশ (কিংশুক), পারিজাত, পারুল, পিয়াল, বকুল, বট, বনফুল (ও বনলতা), বাঁশ (বেনু), মধুক (মহুয়া), মাধবী (মাধবিকা), রঙ্গন, রজনীগন্ধা, লবঙ্গলতা, শমী, শর, শাল, শিমুল, শিরীষ, শেফালি (শিউলি, শেফালিকা), শ্যাওলা (শৈবাল), সজনে, সর্ষে (সরিষা), সেঁউতি, হেনা, প্রাণের বীণায় যে নাম বাজে, উদ্ভিদ কথা, এক নজরে, References, Personal Data Sheet, লেখকের অন্যান্য রচনা, নির্দেশিকা ও গ্রন্থপঞ্জী, বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার। এছাড়া গ্রন্থে ৫৮ ও ৫৯ পৃষ্ঠার মাঝামাঝি ১৬ পৃষ্ঠা আলাদা করে উদ্ভিদ ও ফুলের রয়েছে রঙীন চিত্রাবলী। গবেষকের গবেষণায়

ধরা পড়েছে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল সংখ্যক গানে ৬৭ রকমের উদ্ভিদ বা ফুলের নাম উল্লেখ করেছেন মোট ৬৮৭ বার। এই উদ্ভিদ আর ফুলের তালিকায় যে কেবল সুদৃশ্য, সুগন্ধি ফুলই রয়েছে তা নয় অবহেলিত 'কচু'কেও রবীন্দ্রনাথ একেবারে প্রথম জীবনের 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে ব্যবহার করেছেন—যেমন 'চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি'। তন্বিষ্ট এই গবেষকের গবেষণায় জানতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ কিছু বিদেশী ফুলকেও তাঁর রচনায় রেখেছেন, কখনও সরাসরি, আর কখনও দেশী নাম দিয়ে তাকে আপন করে নিয়েছেন। যদিও এ গোত্রীয় পুষ্পের প্রকাশ কবির গানে কম, বেশীটাই কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন কবি। উল্লেখ্য, ফুলের উপমা রবীন্দ্রনাথের গানের পরতে পরতে লক্ষ করা যায় 'ফুলের গন্ধে চমক লেগে' কবির মত মেতে ওঠা থেকে অস্পৃশ্যা চণ্ডালিকার ব্যথার অনুভূতির প্রকাশেও রয়েছে- 'ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির পরে।' রবীন্দ্রনাথ কেবল ছন্দ মেলাতে ফুলের নাম জেনে তৃপ্ত থাকেননি, খুঁজতে চেয়েছেন কোন বিশেষ নামের ফুলটির স্বরপ কেমন।

এ প্রসঙ্গে লেখক 'পথে ও পথের প্রান্ত'র পত্রসংখ্যা ৪২ এ ইন্দিরা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের অবতারণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> ''ফুল ফোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। কিন্তু মানুষ তাকে আপনার মনে স্থান দেয় নাম দিয়ে। ... কাব্যের নামমালায় রোজই বার বার পড়ে আসছি যূথী, জাতি, সেঁউতি। ছন্দ মিলনেই খুশি থাকি, কিন্তু কোন ফুল জাতি, কোন ফুল সেঁউতি সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারও উৎসাহ নেই। জাতি বলে চামেলিকে অনেক চেষ্টায় এই খবর পেয়েছি কিন্তু সেঁউতি কাকে বলে আজ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন করে উত্তর পাইনি।''[১৯]

গবেষক মনে করেন, উদ্ভিদ ও ফুল সম্পর্কে কাব্য ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হতেই পারে কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে ফুলের স্বীকৃতি উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে পুষ্পবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের গভীর চিন্তাভাবনার সঙ্গে শুধু আমাদের পরিচিতিই ঘটে না, অসংখ্য অজানা তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং এই গ্রন্থটি এই পর্বের যে কোন আলোচনায় সমাদৃত হবে, সন্দেহ নেই।

।। আট।।

গবেষণার প্রাথমিক প্রয়োজন গ্রন্থপঞ্জি। আর এমনি একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থপঞ্জি ড. মৌসুমী পাল এর সংকলন গ্রন্থ ''রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চা ঃ গ্রন্থপঞ্জি'', প্রকাশিত হয় ২০০০ সালের মে মাসে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন ড. অরুণ কুমার বসু, যা গ্রন্থটিকে বহুমাত্রিকতা দান করেছে। গ্রন্থের সূচিপত্রে রয়েছে—রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ, সংকলনভুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ নিবন্ধ, ইংরাজি রচনা, সংযোজন। ড. পাল নিবেদনে বলেছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি পূর্বে পাওয়া গেলেও সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক এত আলোচনা প্রবন্ধ নিবন্ধের বিষয়টির পঞ্জীকরণ এর আগে কেউই করেননি। এসব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বেশির ভাগই লেখিকা সংগ্রহ করেছেন 'কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র' থেকে। ড. পাল এই গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের পথে অধ্যাপক ও প্রখ্যাত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অরুণ কুমার বসুর ভাবনার আলোয় পথ চলেছেন তা ভূমিকা থেকেই জানা যায়। মূলত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরবর্তীদশক থেকে শুরু করে প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক

আলোচনাকে দুই ভাগে এই গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগ রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে লিখিত সম্পূর্ণ গ্রন্থের পঞ্জি, এর মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে সংকলিত গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধের তালিকাও রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে লিখিত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন এ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের রচনার নিদর্শন থাকা এই সংকলন গ্রন্থ রবীন্দ্রসঙ্গীতের গবেষণায় নিঃসন্দেহে প্রভূত সাহায্য করবে পরবর্তী দীর্ঘকালের গবেষকদের গবেষক মৌসুমী পালের তন্বিষ্ট পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রশংসা করবেন যে কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী পাঠক ও গবেষক।

সূত্রনির্দেশ—

১। গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, রবীন্দ্রসঙ্গীত মানস, প্যাপিরাস, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯১, পৃঃ-৯১-৯২।

২। স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, প্যাপিরাস, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃঃ-৫৪-৫৫।

৩। আল্পনা রায়, আলাপ থেকে বিস্তার, প্যাপিরাস, কলকাতা, মে ১৯৯২, পৃঃ-৭০-৭১।

৪। সুধীর চক্রবর্তী, নির্জন এককের গান রবীন্দ্রসঙ্গীত, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ-৭৩।

৫। তদেব, পৃঃ-১৪৮।

৬। সুধীর চন্দ, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঙ্ম রাগ-সুর নির্দেশিকা, প্যাপিরাস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২, পৃঃ-১৬।

৭। লীলাশ্রী বসু, নিভৃত প্রাণের দেবতা, বেস্ট বুক্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ-৭।

৮। তদেব, পৃঃ-১৫-১৬।

৯। অপূর্ব বিশ্বাস, ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র-কবিমানস, দে'জ, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃঃ-২০।

১০। তদেব, পৃঃ-৭২।

১১। তদেব, পৃঃ-১০৫।

১২। তদেব, পৃঃ-১৩২।

১৩। তদেব, পৃঃ-১৮১।

১৪। তদেব, পৃঃ-১৮২-১৮৩।

১৫। গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, রবীন্দ্রকাব্যসঙ্গীত সমীক্ষা ও সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭, পৃঃ-১০।

১৬। তদেব, পৃঃ-৪০-৫৪-১০০।

১৭। তদেব, পৃঃ-১৩৫।

১৮। কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ, সুদর্শনা, গুয়াহাটি, মে ১৯৯৭, পৃঃ-৩৬।

১৯। দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতে উদ্ভিদ ও ফুল, বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৯, মুখবন্ধ পৃষ্ঠাঙ্গ নেই।